Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকসাহিত্য

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.8
Pages	173-198
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকসাহিত্য

মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন

লোকসাহিত্য কি এই প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন–''গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, লোক– সাহিত্যকে আলোচনার সাহায্যে বুঝানো সম্ভব নহে।''[১] তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, একে জানতে হলে সেই গ্রামীণ পরিবেশে ফিরে যেতে হবে। তার মতে–''ইহার রস গ্রহণ ও দান করিতে হইলে, স্বাভাবিকভাবে রসের সহিত রসনার যোগ সাধন করিতে হইবে।''[২] লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে বহু মতামত চালু রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়–''বস্তুতঃ ইহা মুখে মুখে রচিত এবং যুগ যুগ ধরে কাব্য রসিকদের মধ্যেই সংরক্ষিত হয়ে আসছে''।[৩] ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, ''লোকসাহিত্যের সাধারণ সংজ্ঞাই হল যা লোক মুখে প্রচলিত–''।[৪] লোকসাহিত্যে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসংগীত, লোকগীতিকা, লোককাহিনী বিবিধ অংশ জুড়ে আছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রাম বাংলার জীবন উত্থিত সঞ্জীবনী সুধা।

সারা দেশের লোকসাহিত্যের নিরিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জেলার লোক প্রধানত কৃষিজীবী। তাছাড়া চাকুরে, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে ইত্যাকার পেশার লোকও এখানে রয়েছে। এখানে লোকজীবনের যে ধারা অব্যাহত তা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই জেলার

বিস্তৃত পটভূমিতে যে লোকসাহিত্যের উপাদান ছড়িয়ে, ছিটিয়ে আছে তা আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে। এখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ছড়া। এই গুলোর মধ্যে অপরিণত মনের অনায়াস রূপ, অসংলগ্ন বক্তব্য লক্ষ্য করা গেলেও বিষয় মাধুর্যে এবং সহজ প্রকাশ ভঙ্গির ফলে তা শ্রোতা ও পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ছড়াগুলো আলোচনা করলেই বিষয়টির যথার্থতা নিরূপণ করা যাবে।

গাছ অবলম্বনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে এক ধরনের খেলা প্রচলিত আছে কিশোরদের মধ্যে। গাছের ডালে একজন ছেলে বসে থাকে। তাকে 'গাচ্ছা' বলা হয়। আর অন্যজন মাটিতে থাকে। পরস্পরকে লক্ষ্য করে উভয়ে ছড়া কাটে--

গাচ্ছারে ভাই গাচ্ছা।
কিরে ভাই গাচ্ছা?
গাছে উঠছত কে রে?
বাঘের ডরে।।
বাঘ কই?
ছালি মাডির তলে।।
কি তা করে?
বইদা পাড়ে।।
ক' কুড়ি কডা বইদা?
ছ' কুড়ি ছডা বইদা।।
আমারে একটা দিবে?
ছুঁইতাল্লে নিবে।।

[কিতা - কি; বইদা - ডিম; কড়া - কয়টা; ছড়া - ছয়টা]

তখন মাটির ছেলেটি গাছের ছেলেটিকে ধরার জন্য গাছে ওঠে। এক সময়ে গাছের ছেলেটিকে ছুঁতে পারলেই 'গাচ্ছা' মারা পড়ে। খেলা শেষ হয়।

দীর্ঘ দিন ধরে বৃষ্টি না হলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে গান গাওয়ার রীতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলেও বহুকাল থেকেই 'মেঘ রাজার' গান ছেলে মেয়েরা গেয়ে থাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টির কারণে আকাল দেখা দেয়। দাবদাহে মাঠ, ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে। তখন এই অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা ভাঙা কুলা মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি 'মেঘ রাজার' গান গায়-

আয় মেঘ ঝেঁপে।
ধান দিমু মেপে।।
কচুর পাতা হলদি।
মেঘ আয় জলদি।।
এক বাটা পান।
ঝুম ঝুমাইয়া নাম।।
লেবুর পাতা করমচা।
যা মেঘ উড়ে যা।।

এই ছড়াটির অন্যরূপ অন্যত্রও দেখা যায়--

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ধান দিব মেপে।।
নেবুর পাতা করমচা।

যা বৃষ্টি ধরে যা।।
খাজুর পাতা হলদি।
মেঘ নাম জলদি।
এক বিড়া পান।
ঝুপ ঝুপাইয়া নাম।।
কানা মেঘারে তুই আমার ভাই--।
একটু খানি পানি দেরে শাইলের ভাত খাই।।[৫]

এমনি করে এক অঞ্চলের ছড়া ও অন্য অঞ্চলের ছড়ার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *লোকসাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন-- ''আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান।"[৬]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাখাল ছেলেরা মাঠে গরু চড়ায়। মাঠে ঘাস না থাকার কারণে গরুকে পেট ভরানো সম্ভব হচ্ছে না। আর গরুর পেট না ভরলে এর জন্য রাখালকে দায়ী করা হয়। তাই গরুকে বেশি করে পানি খেয়ে পেট ভরার জন্য তারা ছড়া কাটে--

ঘাস নাই, ঘোস নাই।
গরু রাইখ্যলার দোষ নাই।।
গঙ্গা মা দিছে জল।
জল খাইয়া গরুর পেটটা ভর।।

ছড়ায় পূর্ববর্তী লাইন এবং চিত্রের সঙ্গে পরবর্তী লাইন বা চিত্রের মিল নাও থাকতে পারে। তবুও একই ছড়ায় বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের সার্থক রূপায়ণ সবাইকে আকৃষ্ট করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের এমনি একটি ছড়া--

ধান ক্ষেতে পালের নাও,
সুয়ায় ডাকেরে।
ভাবীর হাতে সন্নের চুড়ি,
ঝিলিক মারে রে।।

এখানে ধান ক্ষেতে পালের নৌকা দেখে জনৈক ব্যক্তি না হয় ডাকাডাকি করছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভাবীর হাতে সোনার চুরির ব্যাপারটি অসঙ্গতি ঠেকে। আসলে শিশুরা ছড়াগুলোতে বার বার দৃশ্য পরিবর্তন করে। তাছাড়া, অপরিণত মন দ্বারা কল্পনাকে সুন্দর করে গ্রন্থন করাও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে তাঁর *ছেলে ভুলানো ছড়ায়* বলেন--''জগৎ সংসারে এবং তার নিজের কল্পনাগুলো তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে; একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকরণ সূত্র ধরিয়া জিনিষকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।''[৭]

কোন কোন ছড়ার মধ্যে সুখ-দুঃখের এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে। নিম্নের ছড়ায় সৎমায়ের নিপীড়নের চাল-চিত্র ব্যক্ত হয়েছে সুন্দরভাবে।

টুনটুনি লো সই।
তর কাছে মনের কথা কই।।
মা মরেছে শিশু কালে।--
বাপ করেছে বিয়া।।
সৎ মা ভাত দেয়।
তিনডা ঝারা দিয়া।।

শিশুর এই আর্তি সবাইকে মর্মাহত করে। শিশুকালে মা হারানোর বেদনা নিয়ে দিনের পর দিন যে বেড়ে উঠেছে তার প্রতি সহানুভূতি নয়, বরং শিশুটির সৎ মা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে।

গ্রামে ধান ভানার প্রচলন আছে। কৃষকরা মাঠ থেকে ধান কেটে এনে ধান মাড়িয়ে, সিদ্ধ করে গোলায় ভরে। পরে বাড়িতে বাড়িতে মহিলাদের ধান ভানতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের একটি ছড়ায় ছোট ছোট মেয়েদের ধান ভানার কথা ফুটে উঠেছে।

উত্তরে ঝিকিমিকি।
পশ্চিমে তারা।।
ছোড় ছোড় পুরি পাইনে।
ভানছে বারা।।

[ছোড় ছোড় -- ছোট ছোট, পুরি পাইনে -- মেয়ে ছেলে, বারা-- ধান ভানা]

এক সময় হা-ডু-ডু খেলায় গ্রাম মেতে উঠতো। এখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে এই খেলা হয়ে থাকে। তবে এই খেলায় হাত, পা ভাঙা বা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে অভিভাবকেরা ছেলেদেরকে এ খেলা না করার জন্য বারণ করে। কিন্তু ছেলেরা বাধা মানে না। তাদের মতে--

হা-ডু-ডু খেলতে গেলে--
মা বাপ করে মানা।
হাত-পা ভাইঙ্গা গেলে--
যাইবো ডাক্তার খানা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। এই মাটিতে অনেক ফসল ফলে। তাই এই মাটির প্রতি তাদের যথেষ্ট সম্মান।

কালি সিমার মাডি।

ছেলাম কইরা আডি।[৮]

[কালি সিমা -- ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার (দঃ) ইউনিয়নের একটি গ্রাম;

মাডি -- মাটি;আডি -- হাঁটি]

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ছেলে-মেয়েরা রোদের জন্য ছড়া কাটে--

রইদ উঠ ফাইট্যা-

গুয়া দিমু কাইট্যা।

ছেঙ্গী ক্ষেতে ছেঙ্গা ফুল--

ছেঙ্গ ছেঙ্গাইয়া রইদ উঠ।।

গ্রামে দাদা-দাদী, নানা-নানীরা ইয়ারকির ছলে নাতি-নাতনীদের সাথে বেশ রস করে থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের একটি ছড়ায় এর পরিচয় মেলে--

নাতিন যাইওনা--

চান্নি পইরা রাইত।

বিয়া কইরা রাইখ্যা দিব--

মেম্বারের বাইত।।

[চান্নি - চাঁদনী; পইরা - ফরসা; বাইত - বাড়িত]

অনেক সময় দেখা যায় রোদও উঠছে, বৃষ্টিও হচ্ছে। এই পর্যায়ে ছেলে-মেয়েরা এই ছড়াটি কাটে--

হিয়াইল্লা বিয়া করে--
পাতলা মাতায় দিয়া,
হিয়ালনী চাইয়া থাহে--
ভাঙ্গা বেড়া দিয়া।।

কিছু ছড়ায় আক্রমণের ভাবও লক্ষ্য করার মতো--

দাদা গেছে পাদাইয়া --
দিমু টিক্কা লাগাইয়া।
টিক্কা গেছে মইজ্জা--
দুরু শালা বাইত যা।।

কিছু ছড়ায় ১৯৭১-এর সমসাময়িক অবস্থার প্রসঙ্গও এসেছে--

বাকুম বাকুম করিস নারে জালালী কইতর,
আধা পথে গিয়া দ্যাহি ছাগলের মতন।
ছাগলের শিং দিয়া দোতরা বাজাই,
বইশের শিং দ্বারা নাস্তা করাই।।
আইর মাছের কাডা কোডা বোয়াল মাছের দাড়ী,
টিক্কা শালায় বিয়া করে মজিব সাবের বাড়ী।।
আয়রে আয় দুইডা আডার রুডি খাইয়া যা--
আডার রুডি চলে না বুইড়া বুইড়ী মরে না।।

এই অঞ্চলের বিয়ে বিষয়ক একটি ছড়া যা ছেলেমেয়েরা কেটে থাকে--

পারভীন পারভীন কাপড় পিন।
বুইধ্ বারে তোর বিয়ার দিন।।

আলু পাতা জম জম।
জামাই আইছে তিনজন।।
নাস্তা দিলে খায় না।
বিদায় দিলে যায় না।।

অবশ্য এই ছড়াটি খেলার ছলেও ছেলেমেয়েরা কেটে থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

গ্রামে গ্রামে আজো হা-ডু-ডু, দাড়িয়া বান্দা, গোল্লা ছুট, বউচি খেলা, সী খেলা জমে থাকে। এ সব খেলা নিয়ে নানা ধরনের ছড়া এখানে প্রচলিত। এখানে কিছু খেলা বিষয়ক ছড়ার উল্লেখ করা হলো--

(ক) ছি ছি নাইয়া--
নৌকা দিমু বানাইয়া
যদি নৌকা উড়ে
বিয়া দিম দূরে।।

(খ) কুত কুত কুত --
বিলাতী দুত।
আমরা আমরা কাইজ্জা লাগছি--
আব্বার কি দোষ।।
[দুত - দুধ, কাইজ্জা - ঝগড়া]

(গ) চি কুত্ কুত্ ডালে ডালে-
ডাল ভেঙ্গেছে নদীর কূলে,
নদী কেটে পানি তুলে।।

(গ) ছি ছি ছি
জমিদারের ঝি।
রানছত কি?
বাইগন, শুটকি।।

(ঘ) কুত্‌কুত কুতানী,
লাইলী আমার মামানী।
বজলু আমার ভাই,
ছোবাইন্নার দাঁড়িত ধইরা
মক্‌কা শরীফ যাই।।

(ঙ) আমার বাড়ির পুবে --
জিঙ্গলা কাডি কোবে।
মাছ রাঙা বইয়া রইছে--
মাছ খাওয়ার লোভে।
[জিঙ্গলা - বাঁশ; কাডি - কাটি; কোবে - কোপে]

(চ) বাক্ বাকুম কইতরের টং।
বাপের বিয়া পুতের রং।।

(ছ) মশা মারি কষা কষা--
পায়ে বান্ধি দড়ি।
হগল মশা যাইগ্যা দ্যাহি--
কালুর ঘরের তুলিত।।
[তুলিত - চূড়া]

ধাঁধা বা হেঁয়ালিগুলো লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা, এইগুলো প্রাচীন সমাজের পরিণত মনের সৃষ্টি। জাতির নিজস্ব জীবনের একান্ত

পরিচিত ব্যবহারিক উপকরণ অবলম্বনেই ধাঁধা তৈরী হয়ে থাকে। আকারে ধাঁধাগুলো ছোট হলেও এর উত্তর দিতে গেলে বুদ্ধির সরসতা থাকতে হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে অনেক ধাঁধা প্রচলিত আছে। এখানে কিছু ধাঁধার অর্থসহ উল্লেখ করা হলো--

গাঙ্গের পাড়ে ডুপিডা হুইত্যা আধার করে।
লেঙ্গুরে পারা দিলে কেত্ কুত করে।।--ঢেঁকি

[ডুপি - পাখী বিশেষ; হুইত্যা - শুয়ে; আধার - আহার, খাবার]

চট্টগ্রাম জেলায় এই ধাঁধাটিরই রূপ --

ইলৎ লুডে বিলুৎ লুডে।
লেজৎ ধইল্যে ফালদি উডে। [৯]

নোয়াখালী অঞ্চলে--

নদীর মদ্যে রগা দরে।
ঠেঙ দিলে ক্যোঁত করে। [১০]

কান্ধার উপর কান্ধা।
ফুল ধরে বান্ধা।। -- কলার থোর

গাঙ্গের পার তুরুম গাছ--
তুরুম তুরুম করে।
একটা তুরুম খেয়ে দ্যাখো--
শরীল ক্যামন করে।। --মরিচ

এত গাছ টান দিলে--
বেত গাছ লড়ে।
কইক্কায় ডিম পারলে--

গঙ্গায় ভাসে।।। --ঘি

[কইক্কা - পাখী বিশেষ]

আকাশ থেকে পড়ছে তিল।

তিল করে বিল বিল।। --পোনা মাছের ঝাঁক

আড়াত থাহে, পাতে মুতে। --লেবু

[আড়াত-আড়াল]

সবুজ বুড়ী হাটে যায়।

হাটে গিয়া চিমটি খায়।। -- লাউ

লাল মিঁয়া হাটে যায়।

দুই গালে থাপ্পর খায়।। --মাটির কলসী

এই ধাঁধাটিই নোয়াখালী অঞ্চলে--

লাল মিঁয়া আঁড়ো যায়।

বিনা দোষে থাবড় খায়।। ১১

আন্ধার ঘরে বান্দর নাচে।

না করলে আরো নাচে।।-- পাখা

গাঙ্গেদা বাইস্যা যায় এক ছড়ি কলা।

হরি বউয়ে কাইজ্জা লাগছে কার কদ্দুর গলা।।-- হাঁস

[হরি - শাশুড়ি]

মামুর বাড়িত গেলাম।

মামু দেইখ্যা দুয়ারডা দিল।। --শামুক

চাইরদিগে বেড়ার কাডা।

মাঝ খানে লাল বেডা।। -- আনারস

এই দেখলাম এই নাই।
তারা ক্ষেতে বাঘ নাই।। -- আকাশের বিজলী

লম্বা বেডা হাবিজ।
গলা ভরা তাবিজ।। -- সুপারি গাছ

উচ খোচ বুক টান।
কোন দেবদার চার কোণ।। -- ঘর
[দেবদা - দেবতা]

কালা কালা কামিনী
কলা গাছ খায়
রাইত অইলে কামিনী
ঘরে ফিরে যা।।-- ছাগল

এক ছাগলের তিন মাথা।
খায় লতা পাতা।। -- চুলা

আছানক এক জিনিষ দেখে এলাম হাটে।
এক ছেলে দুই মায়ের পেটে।। -- দরজার খিল

চাইর দিগেদা লোহার লাইল।
কেমনে ক্ষেতে জোয়ার আইল।। --ডাব

আমার সোনার বাংলা-তুমি কেন ভাঙ্গলা।
তোমারে আঘাত করলাম তুমি কেন ভাঙ্গলা।। --
মৌমাছির হুল ফুটানো

এখান থেকে মারলাম বাঁটি।
বাঁটি গেল কামার আটি।। -- সড়ক

মামুর বাইত গেছলাম চাইতাম।

দিল না আইতাম।। -- আনৃতা

জন্মে সাদা কর্মে কালা
গলায় লোহার হার।
লাফ দিয়ে আদর করে
লম্বা লেজ তার।। -- কনুই জাল

হামরাইয়া দিলে কামড়ায়া ধরে।
টবর টবর রস পড়ে।। -- আখ

[হামরাইয়া – ঢুকানো বা প্রবেশ করানো;
টবর টবর – ফোঁটা ফোঁটা]

ঢালা ভরা সুপারী, গণতে পারে না বেপারী -- আকাশ ও তারকারাজি

একটুইন্না পোলা পাইন দুত ভাত খায়।
বড় বড় গাছের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়।। -- কাঠ ঠোকরা পাখি

উঠান ঠন ঠন পিরাত বাড়ী।
কোন দাদার জিবরাত দাড়ী।। -- শামুক

বাপের একটা ছোড পুত।
জইল্লা উড়ে বুত বুত।। -- দেশলাইয়ের কাঠি

আমার একটা ছাগল আছে বট পাতা খায়।
সাতশ দালান ভাইঙ্গা যুদ্ধ করতে যায়।। -- ঝড়

আছাড় দিলে ভাঙ্গে না।
টিপের ডর লয় না।। -- ভাত

আগের বাড়ীত আগুন লেগেছে
মধ্যের বাড়ীত ডেকে বলে,

পিছের বাড়ীত পানি ঢালে
চুমা দিলে কান্দে--
মাডিত রাখলে শান্ত হয়।। -- হুক্কা
এ তুন গাছে বেতুন ধরে।
সন্ধ্যা অইলে মইরা পড়ে।। -- বাজার
গাঙ্গের পাড় ভৌত্তা হাগ।
এমন এমন করে।
কোন বেডার শক্তি নাই,
তুইল্লা আনতে পারে।। -- পায়খানা
মামুর বাড়ীত গেলাম।
হিঙ্গাইলদা ভাত খাইলাম -- ঢেঁড়শ
ল্যাইয়া পুইচ্চা ধপ্পর। - ঝাড়ু
আছানক জিনিষ এক দেখে এলাম হাটে।
দুই হাটু আট পা লেজ থাকে পিঠে।। -- দাঁড়ি পাল্লা
[আছানক - আশ্চর্যজনক]

নোয়াখালী অঞ্চলে এই ধাঁধাটি এইভাবে--

আচাইজ্জা এক জিনিস দেই আইছি আঁডে।
আষ্ট ঠেং দুই আড়ু, লেজ আছে হিডে'। [১২]
মামুর বাইত গেলাম।
বন বিছাইয়া রইলাম।। -- চিন্দাইর
হাঁসের মত ভাসে--

কোত্তার মত নাচে।

বাপের লেজ নাই--

পুতের আছে।।--ব্যাঙের ছানা

[কোত্তা-কুকুর]

বাঞ্ছারামপুর চিলের বাসা।

কোন গাছের ফল কাঁচা ।। -- পেস্তা

এক্কা মারে দোক্কা মারে।

মারতে মারতে চেপ্টা করে।। -- চিড়া

বাপের একডা ছোড় পুত।
জ্বইল্লা উডে বুত্ বুত্।।-- দেশলাইয়ের কাঠি

এক টিপ দুই টিপ

তিন টিপেতে ভরি,

কাহাইলের উপর

কাহাইল থুইয়া

আন্‌জাদা ধরি।

[কাহাইল - কটিদেশ; আন্‌জাদা - এঁটে]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের কিছু ধাঁধায় আক্রমণাত্মক ভাব আছে। যেমন --

কাঁচা বেলায় তুক্ তুক্ --

পাকলে সিন্দুর।।

এই শ্লোক -- যে না ভাঙ্গাইতে পারে--

সে হয় ইন্দুর।। -- মাটির পাতিল

লোহার প্যাচ-পোচ, ইস্প্রিংয়ের তালা।
এই শিল্যক যে না ভাঙ্গাইতে পারে--
সে হয় আমার শালা।। -- রেডিও
[শিল্যক - শ্লোক]

লাল কাঠ, লীল কাঠ।
অইলদা কাঠের জোড়।।
এই শিল্যক না ভাঙ্গাইতে পারলে -
শ্বশুর বাড়ীর চোরা।। -- পালকি
[লীল - নীল; অইলদা - হলুদ]

উপর থেইক্কা পড়ল ফোটা--
ফোটার ভিতর লউ।
এই শিল্যক না ভাঙ্গাইতাল্লে--
সব আমার বউ।। -- জাম

এই অঞ্চলের কিছু কিছু ধাঁধায় ছড়াকারে প্রশ্ন করা হয়। এর উত্তরও অনুরূপভাবে আসে--

মাছ খাইলা, গোছ খাইলা--
আরো খাইলা ঘি।
এখন তোমরা সবাই মিলে
নিবার চাও কি?
উত্তরে--
ডাইল খাইয়া বাইল করলাম--
আরো খাইলাম ধইন্যা।

এখন আমরা লইয়া যামু--
তোমার বাড়ীর কইন্যা।।

আরেকটি--

উক্কার ভিতর কাট্টার ছাও,
বিচার করে তামাক খাও।।

উত্তরে --

উক্কা করে ফারুত ফুরুত--
নইছা করে রাও।
কোন শালায় কইছে--
উক্কার ভিতর কাট্টার ছাও।।

প্রবাদ বা প্রবচনগুলো মানুষের সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতারই ফল। যুগ যুগ ধরে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যে সকল আপ্তবাক্যে প্রচলিত তাই প্রবাদ বা প্রবচন। বাংলাদেশের মানুষ ঘর গৃহস্থালির চাষবাস, নীতি কথা, আচার অনুষ্ঠান নিয়ে অনেক প্রবাদ মুখে মুখে রচনা করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো উপদেশ ও নীতিকথা প্রচার করা। এখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের কিছু প্রবাদ উদ্ধৃত করা হলো।

যার যা প্রাপ্য, তা সে পাচ্ছে না। অথচ অন্যজনের প্রাপ্তির প্রতিফলন কতটুকুই বা ঘটবে এর উত্তর ধাঁধায় মেলে--

উচিত হরি-- ছেলাম পায় না।
মোয়াই হরি ঠ্যাং বাড়ায়।।
[মোয়াই হরি - খালা শাশুড়ি]

আপনজন হতে পর জন যে ভাল, তা ধাঁধায় ফুটে উঠেছে--

আপনা হতে বেগনা ভালা।
পুরুন দেশের ভিক্ষা ভালা।।
[বেগনা-পর]

প্রায় এই রকম একটি ধাঁধা চট্টগ্রামেও আছে--
আপন হৈতে পর ভালা।
শহরত্থুন জ'অল ভালা। ১৩

নিজ দেশের সামান্য বস্তুও অন্যদেশের অসামান্য বস্তুর তুলনায় ভাল--

দেশের পুডিও ভাল।
বিদেশের কাতলাও ভাল না।।

শত্রুও নিধন আর নিজের ক্ষতির প্রতিও সচেতন এই বিষয়টি এই অঞ্চলের প্রবাদে--
সাপও মারবো।
লাঠিও রাখবো।।

এই প্রবাদটি ঢাকায়ও প্রচলিত--

সাপও মারা যাক।
লাঠিও বজায় থাক।। ১৪

পুর্ব পুরুষদের রীতি অনুসরণ করে উত্তর পুরুষেরা। একথাটি প্রবাদে--

আগের আল যেমনে যায়।
পিছের আল এমনিই যায়।

এই প্রবাদটি নোয়াখালী অঞ্চলে--

আগের আল যেম্‌নে যায়।
হিঁছের কালও হেমনে যায়। [১৫]

উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কোন কিছুই ঠিক মতো চলতে পারে না--

সর্দার ছাড়া গাঁও।
মাঝি ছাড়া নাও।।

কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সে বিষয় সম্পর্কে বলা হলে এই প্রবাদটি খাটে--

মামুর বাড়ীর গপ, মার কাছে ছাড়ে।।

খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ নেই কিন্তু এর পক্ষে সোচ্চার--

চুরিতো চুরি, আবার সিনাও জোরি।।

গরীব লোকের বিলাসিতাও ধাঁধায় ফুটে উঠেছে--

খাইতে পায় না ফহিন্নী
মাডাদা হোছে।।
[ফহিন্নী-ভিক্ষুক; মাডা-দধি]

অন্য ধাঁধায়-

হগিন্নীর পুতের কান্ধ ছাতি।
তার বাপে টানে মরা আতি।।

আসল জিনিষের খবর নাই, অথচ অন্য জিনিষ নিয়ে মাতামাতি--

হাইয়ের নামে লেশ নাই, দেওর চৌদ্দজন।।

ব্যবসা-বাণিজ্যে হিসাব-নিকাশের গুরুত্ব রয়েছে। যারা হিসাবী তারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বেহিসাবীদের পরিণতি হয় শোচনীয়। এই সম্পর্কে প্রবাদ বলে--

হিসাবে তরে--বেহিসাবে মরে।।

অনুরূপ প্রবাদটি নোয়াখালীতেও আছে--

ইসাবে তরে -- বেইসাবে মরে।। [১৬]

সময় মতো আমরা অনেক কাজই করি না, অসময়ে সে কাজ করা হলে--

হাই মরেছে আগুনে।

কোহান দিছে ফাগুনে।।

[আগুনে - অগ্রহায়ণে; কোহান - কাঁদা]

যার যা নাই, তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন--

গলা নাই বেডা--

গীদ্ গায় মনের অভিলাষে।

বউ নাই বেডায় হউর বাত যায়--

পুরাণ লেশে পেশে।।

যে ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতে হয়, তার উপযোগিতা সর্বাগ্রে ভাবতে হয়--

দক্ষিণদুয়ারী ঘরের রাজা,

পুব দুয়ারী তাহার প্রজা।
পছিম দুয়ারী খাজনা নাই;
উত্তর দুয়ারীর মুখে ছাই।।

অবশ্য এই প্রবাদটি সর্ববঙ্গীয়। কোন কাজ দৈবক্রমে হয়ে গেলো। দেখা যায় পরবর্তীতে কাজটি করার দাবীদারের অভাব হয় না--

ঠেডা পইড়া বগা মরে।
হগিরের কেরামতি বাড়ে।।

এই প্রবাদটিও দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত--

ঢেঁকি বেস্তে গেলেও ভারা ভানে।।

এই প্রবাদটিও দেশের সর্বত্র প্রচলিত। সময় থাকতে কোন জিনিষ মূল্যায়িত হয় না। সময়ান্তরে এর মহার্ঘ বেড়ে যায়--

থাকতে চিনে না হাই।
মরলে হয় রামচন্দ্র ঘোষাই।।

হঠাৎ বড় লোক হলে পূর্বের সবকিছুই তার কাছে বিসদৃশ ঠেকে--

দুই দিনের যোগী না, ভাতের কয় অন্ন।

দুই কুল রক্ষা করতে গেলে গ্রামাঞ্চলে এই প্রবাদটি খাটে-

হাইরের লাইগা অ কান্দে।
হোটকি ছালুন অ রান্ধে।।
[হাইয়ের - স্বামীর; হোটকি - শুঁটকি]

যেখানে যার উৎপত্তি সেখানেই তার বিনাশ--

ক্ষেতের ইডা ক্ষেতেই ভাঙ্গে।
লাইলে তুলে না।।

আসল জিনিষের খবর নাই অথচ আনুষঙ্গিক জিনিষ নিয়ে বাড়াবাড়ি প্রবাদে ধরা পড়েছে--

গাই না কিনতেই, দোয়ানী লইয়া টানাটানি।।

একজনের উপার্জন অন্যজনে ভোগ করলে--

ডিম পারে হাসে
মজা মারে বাঘদাশে।।

একজনে অধিক ভোগ করলে এই প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে-

হাইয়েরে না দিয়া পিডা--
ভাইয়েরা না দিয়া।
চইদ্দ কুড়ি পিডা খাইল--
ক্ষেতা মুড়ি দিয়া।।

মূল শক্তির কাছে সামান্য শক্তি নিষ্প্রভ এই বিষয়টি প্রবাদে ফুটে উঠেছে--

হাজার কাউয়া এক বাওরাল।।

অথবা-

বাঘের এক ছা
হিয়ালের হাত ছা ।।

অনেকেই নিজের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে তার কাজের উপকরণের উপর দোষ চাপায়--

নাচতে না জানলে
উঠান বেঁয়া।।

এই প্রবাদটি সর্বদেশীয়।

এক সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ হেঁটে আগরতলা গিয়ে বন জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদ করতো। তাদের দৃষ্টিতে আগরতলা ছিল বহু দূরের পথ। ঘর ছেড়ে সেখানে যাওয়া সহজ নয়। এই জিনিষটি বুঝাবার জন্য--

কোথায় আগর তলা
কোথায় চকির তলা।।

গ্রামে শাশুড়িরা বধূকে নানাভাবে নিপীড়ন করে থাকে। তাকে ভাত দিলে ঠিকমতো তরকারি দেয় না। তরকারিতে ব্যাঙ পড়ে তা অযোগ্য হয়ে পড়েছে বিধায় শাশুড়ি বধূকে প্রচুর তরকারি দিচ্ছে। শাশুড়ির এই আকস্মিক পরিবর্তনের হেতুও বধূ বুঝেছে--

উনজ্জির উপর উনজ্জি--
চানোর মধ্যে ব্যাঙ।
আজ কেন গো সাইবানী--
কট্টা ভরা চানো দেন।।

ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ছাড়াও এই অঞ্চলের নবীনগর উপজেলায় জারি গানের ঐতিহ্য আজও আছে। লোক-কাহিনী, পালাগান, লোকসংগীত, কিংবদন্তী, ডাক, খনার বচন ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারা এখানে সমৃদ্ধ। এইগুলো উদ্ধার হলে

লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডারে কিছুটা হলেও সংযোজিত হবে এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টিও আকর্ষিত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহম্মদ এনামুল হক, *লোকসাহিত্য : বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্য,* শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাং/এ, ভাদ্র, ১৩৯২, পৃ ৩৮২,

২ *পূর্বোক্ত*

৩ মুহম্মদ মতিউর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানের লোকসাহিত্য,* মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ: ১৩৬৬-৬৭, পৃ ২৫

৪ ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, *মুরশিদী গান,* দৈনিক সংগ্রাম, মার্চ ৯২

৫ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য,* ১ম সংস্করণ, ১৯৫৪, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ ১৪২

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুর্নমুদ্রণ ১৩৯১, পৃ ৪৭

৭ *পূর্বোক্ত,* পৃ ১২

৮ শ. ম. শহীদ, *ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটি ও ফসল,* ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্মরণিকা ১৯৮৪, পৃ ৪৭

৯ ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য,* বাং/এ, ভাদ্র ১৩৯১, পৃ ৬৩

১০ খালেদ মাসুকে রসুল, *নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোকজীবনের পরিচয়,* সাহিত্য পত্রিকা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ৩৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৬, পৃ ১৫১

১১ *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৪৪

১২ *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৫১

১৩ ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য*, বাং/এ, ভাদ্র ১৩৯১, পৃ ১২

১৪ মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, বাং/এ ১ম পর্ব, পৌষ ১৩৯২, পৃ ১৮৯

১৫ খালেদ মাসুকে রসুল, *নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোকজীবনের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩২.

১৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৫৪